কবি যখন নিন্দা অপপ্রচারের ধূম্রজালে

নির্মল কর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই দুই শতাব্দীর একমাত কৃতীপুরুষ যাঁর আশি বছরের জীবনের অর্ধাংশ কেটেছে উনিশ শতকে, বাকি অর্ধাংশ বিংশ শতাব্দীতে। এদিকে থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ সৌভাগ্যবান। কারণ সেকালে বহু বিচিত্র সব প্রতিভাধর এবং কীর্তিমান মানুষের সান্নিধ্য তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বন্ধুত্বের বিচারে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই। অল্প দু'চারজন ব্যতিক্রমী, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রও নবীনচন্দ্র সেনকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর পূর্বসূরি বা সমসাময়িক সকলেই কেমন যেন নীরব কিংবা নির্মম।

বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথের আর্বিভাবের শুরু থেকে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও কবিকে প্রতিনিয়ত কঠোর বিরোধিতা এবং নিষ্ঠুর আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। রবীন্দ্র বিরোধিতার আঘাত আসে সেই সময়কার দাপুটে পত্র - পত্রিকার সম্পাদক, সাহিত্যিক, নাট্যকার, দেশনেতাদের কাছ থেকে। রবীন্দ্র - সাহিত্যের অসারতা প্রামাণে সেদিন যাঁদের কলম ঝলসে উঠেছিল তাঁরা ছিলেন 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি, 'হিতবাদী'র কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মোহিতলাল মজুমদার, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ- এর মতো এক সমালোচকগোষ্ঠী। এঁদের এবং রবীন্দ্র - পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত বাঙালিদের কাজই ছিল নিন্দা ও ব্যক্তিগত অপপ্রচারের ধূম্রজালে কবিকে আচ্ছন্ন করে রাখা। এমনকি একালের কিছু আত্মম্ভরি সমালোচক আছেন, যাঁরা কবিকে পুঁজি করে শিরোনামে আসেন এবং ফুরিয়ে যাবার পর হঠাৎ ভোজ থেকে বেরিয়ে নতুন নতুন তথ্য দিয়ে অভিযোগ করেন, ''রবীন্দ্রনাথ অমুক সম্পর্কে কিছু বলেননি, তমুক সম্পর্কে আরও বেশি প্রশংসা করেননি কেন'' ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সুশোভন সরকার, শিবনারায়ণ রায়, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, হিতেন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। একথাটা এখন বেশ পুরানো হয়ে গিয়েছে যে, রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনায় যশ পাওয়ার সহজতম উপায় রবীন্দ্র বিদূষণ।

সাহিত্যিক - বিরোধ অতি প্রাচীন এবং সর্বব্যাপী। কিন্তু সাহিত্য - সমালোচনার সংজ্ঞা ও রীতিনীতির তোয়াক্কা না - করে সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছেন অশালীন, কুৎসিত ও নির্মম ভাষায়। বস্তুপক্ষে যাঁরা স্রষ্টা এবং শক্তিমান বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসেন, তাঁরা চিরকাল সেই শক্তির পরিমাণে প্রতিবাদ জাগিয়ে যান। গৌতমবুদ্ধ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সকলেই নিউটনীয় দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার উদাহরণ স্বরূপ এই দুর্ভোগ সইতে হয়েছে। আসলে প্রাচীন কাব্য - রীতিতে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়েছিলেন। নতুন কাব্য - রীতি নিয়ে যে -কবি আবির্ভূত হন, সমকালে কোনোদিনই তিনি সামগ্রিক সমর্থন লাভ করেন না। তাই মাইকেল মধূসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছে 'ছুছুন্দরী বধ'। বুদ্ধদেব বসুর নতুন ধারার কবিতা অশ্লীলতার দায়ে অস্পৃশ্য ঘোষিত হয়েছে। ওই একই অভিযোগে জীবনানন্দ দাশকে কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে চ্যুত করা হয়। শেকসপিয়র অনেক দেশজ বিধান ও শিষ্টসম্মত রীতি ভেঙেচুরে দিয়েছিলেন। নেপোলিয়ন প্রাচীন নিয়মকানুনের উপর দিয়ে তার দুর্বার রথচক্র চালিয়ে দিয়েছিলেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন একটা অখণ্ড পরিণত জিনিস, একটা রসময় সত্যকে পৌঁছে দিতে, যেখানে একমাত্র বিশ্বের নিরপেক্ষ চিত্ত 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।

যাকে আমরা প্রতিভা বলি, সেই প্রতিভাকে শনাক্ত করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু সেটা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর কন্যার বিয়েতে আমন্ত্রিত অতিথি বঙ্গিমচন্দ্রকে যে - মালা পরাতে গিয়েছিলেন, সেটা আর এক অতিথি রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'এ মালা ইহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যা সংগীত পড়িয়াছ?' সন্ধ্যাসংগীত যখন মধ্যগগনে, তখনও তাঁকে বুঝতে অনেকে হিমসিম খেয়েছেন। সুতরাং সেকালে রবীন্দ্র - বিরোধী সমালোচকদের তারস্বরে পালা কীর্তনের মূল ধুয়োটি ছিল রবীন্দ্রকাব্য দুর্বোধ্য ও 'অস্পষ্ট। শেলি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মাপে রবীন্দ্রনাথের বিচার করতে গিয়ে 'সোনার তরী'কে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মনে হয়েছে স্ববিরোধী অর্থহীন কবিতা। ধান কাটতে কাটতে বর্ষা আসে কী করে বাংলা ঋতু - বিন্যাস বিচার করে তা তিনি বুঝতে চাইলেন। সুতরাং কবিতাটি দুর্বোধ্য, mystic! দ্বিজু, রায় ছদ্মনামে নব্য কবিদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যত্র লিখেছেন, রবিবাবুর 'সে আসে ধীরে' 'তুমি যেও না এখনই' 'কেন যামিনী না - যেতে জাগালে না' ইত্যাদি 'লম্পটের গান'। রবীন্দ্রনাথের প্রেম বৈষ্ণবী হলেও তা নাকি মানুষী লালসায় জর্জরিত, পাশব ক্ষুধার প্রবেগে উত্তপ্ত। 'চিত্রাঙ্গদা'র বিষয়বস্তু নাকি অশ্লীল। রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে জঘন্য পশুরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ঘরে ঘরে চিত্রাঙ্গাদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়। তাই 'পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিৎ'।

মোহিতলাল মজুমদার উর্বশীর শবব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছেন, উর্বশী স্বর্গের অপ্সরা বা আমাদের আন্তর-জীবনের কোনও আদর্শ নয়, ইউরোপীয় ভিনাস দেবীর ভারতীয় নটীর ছদ্মবেশ মাত্র। অর্থাৎ তাবৎ রবীন্দ্রিয়ানাই হল বিলাতি রোমান্টিক ভাববিলাসিতার বিকৃত প্রতিবিম্ব।

বিপিনচন্দ্র পালের অভিযোগ, রবীন্দ্রনাথের রচনা যত সুন্দরই হোক, দিবালোকে জাগ্রত চেতনার দৃষ্টির মতো সুস্পষ্ট ও সুষীম হয়নি তাঁর রচনা borrowed majesty—পরস্মৈপদী মহিমা! এ-ধারার সাহিত্য 'মুগ্ধ করে কিন্তু স্নিগ্ধ করতে পারে না' কবির যেসব লেখায় বৈষ্ণবভাবের চিত্র দেখা যায়, তাতে চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির গৌড়ীয় রূপ ও রস অনুপস্থিত। সুতরাং সমস্ত রবীন্দ্রনাথই হল মূর্ত ফিরিঙ্গিয়ানা, পরাধীন ভারতের দাসসুলভ পরানুচিকীর্ষা।

রবীন্দ্র সমালোচনার নামে কটুক্তি, কুৎসা তিরিশের দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আসরকে সরগরম করে রেখেছিল 'নবজীবন' 'সাহিত্য' ও 'নারায়ণ' পত্রিকা।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'কড়ি ও কোমল' প্রসঙ্গে বললেন, 'ইহা কড়িও নহে কোমলও নহে, পুরো মিঠিকড়া।' 'রে পায়রা কবি / খোপের ভিতর থাক ঢাকা/ তোর বকবকম আর ফোঁসফোঁসানি। তাও কবিত্বের ভাব মাখা। তাও ছাপালি গ্রন্থ হল

নগদ মূল্য একটাকা'? এধরনের সমালোচক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ সালে লিখেছিলেন, 'সে কোনো কথা ঢাকিয়ে বলিত না। এমন উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলো পর্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চিৎকার করিতে থাকিত।'

এই 'কড়ি ও কোমল' - কে উপলক্ষ করে দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯০৪ সালে 'আনন্দ বিদায়' নামে যে-প্রহসনটি লেখেন, তার ভূমিকায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'চাবকাইয়া দেওয়া কর্তব্য' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

'ঘরে বাইরে' -র নিন্দা করে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বললেন, 'উপন্যাসটি উদ্দাম কামপ্রবৃত্তির পোশাকি রূপ'।

সুরেশ সমাজপতির অভিযোগ, রবীন্দ্রসংগীত 'অবোধ্য', 'জীবনস্মৃতি' 'পল্লবিত রচনা'। 'চোখের বালি' ঘেঁটে বলেন, 'এর আখ্যান কুৎসিত'।

'শনিবারের চিঠি' একদা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, জীবন, শিল্পকর্ম, তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী সব কিছুর প্রতিই তীব্রভাবে ব্যঙ্গ ও আক্রমণ করেছিল। সেই সঙ্গে ছাপা হয় কবির গান ও কবিতার বিচিত্র সব প্যারডি। শালীনতার বাঁধ অনেক সময়ে ভেঙে গিয়েছিল। বিশ্বভারতী সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি' মন্তব্য করে 'বিশ্বভারতী দেশে কী কাজ করিয়াছে? ইহা তো রবীন্দ্রনাথ ও তাহার পুত্রের জমিদারী মাত্র!' এই পত্রিকার প্রধান সেনাপতি ছিলেন সজনীকান্ত দাস। রবির জীবনে শনির প্রবেশ কবিকে বিচলিত করেছিল। এক চিঠিতে সুনীতি চাটুজ্জেকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'শনিবারের চিঠিতে যারা আমার অবমাননা করেছেন...তাঁরা আমার নিন্দায় আনন্দভোগ করে এসেছেন। এটা দেখেছি যাঁরা কোনওদিন আমার লেখার কোনও গুণ ব্যাখ্যা করবার জন্য একছত্রও লেখেননি তাঁরা নিন্দা করবার বেলাতেই অজস্রভাবে বহু পল্লবিত করে লিখেছেন।' যদিও জীবনের অন্তিম পর্বে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ লেখা চিঠিপত্রের মাধ্যমে কবি খুশি হতে পেরেছিলেন সজনীকে তাঁর একান্ত স্বজনরূপে লাভ করে।

স্বদেশে এবং স্বকালে রবীন্দ্রনাথ যত নিন্দা ও কুৎসা সহ্য করেছেন, সত্যিই তা নজিরবিহীন। বহু ব্যক্তিগত অন্যায় আক্রমণ এবং হলাহলকে তিনি পরিপাকা করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। 'অবতার' নামে এক ভুঁইফোড় নিম্নরুচির পত্রিকার প্রচার করে বসেছিল যে, রবীন্দ্রনাথ যৌবনে কুৎসিত যৌনব্যাধিতে ভুগেছিলেন। কবির বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি— যশ ও জনপ্রিয়তার স্বর্ণশিখরে। কবির প্রতি এই অকল্পনীয় নীচতা এবং মিথ্যাচারের কোনও প্রতিবাদই যখন দেশবাসীর কাছ থেকে হল না, বিচলিত রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন, পত্র - পত্রিকায় এর যথেষ্ট প্রতিবাদ না -হলে আদালতে মানহানির মামলা করবেন। কিন্তু তাঁর বৈরাগ্য মনের প্রশান্তির তলায় সব চাপা পড়ে গেল। চিরকালের রবীন্দ্রনাথ সেই সর্বজনীন স্তুতি নিন্দার ঊর্ধ্বে অবিচল থাকলেন। শুধু প্রশান্ত মহলানবীশের কাছে লিখলেন, '...দেশের লোকের হাত থেকে অনেক দুঃখ, অনেক মিথ্যা সহ্য করে এসেছি।... যে দেশে এটা সম্ভবপর হয়, সে দেশে এই অভ্রভেদী অপমানের মন্দিরই আমার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাক, আমি এর বেশি কিছু চাইনে।' সংবাদপত্রে প্রতিবাদ, আত্মপক্ষ সমর্থন এবং আদালতে নালিশ - সব পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকল সেই 'অবতার ফাইল' এ বন্দি হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বড়ো আঘাতটি পেয়েছেন ''কল্লোল' গোষ্ঠী নামের অত্যাধুনিক তথা নবজাগ্রত গণদেবতার পূজারিদের কাছ থেকে। তাঁরা বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ হলেন পোশাকি কবি।' শেকসপিয়র বা মিল্টন, বাল্মীকি বা কালিদাস যে - সামাজিক বৃত্তি বা ভঙ্গির প্রতিনিধি বর্তমানে অচল। সমাজের দীন দুঃস্থ অজ্ঞাত সর্বহারাদের বার্তাই (Vox Populi) আজ সাহিত্যের উপজীব্য। 'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি / সখি জাগো সখি জাগো' ধারার বুর্জোয়া ভাব ও বিলসিতা কবিকে ত্যাগ করতে হবে— বাসাংসি জীর্ণানি! একজাতীয় মনোবৃত্তির অর্থ বিকৃত দোষারোপ এবং অন্যায় যুদ্ধ। কেন-না যাঁরা কিছু গড়েন, গড়েন নিজের মতো করে। অন্যের সৃষ্টি ও সিদ্ধান্ত তাঁদের উপকরণ দিতে পারে মাত্র। শেকসপিয়র কোন্ জগৎ আনলেন, মিল্টন কোন্ লোক গড়লেন, রবীন্দ্রনাথ রূপ দিলেন কোন্ সৃষ্টিকে তার মধ্যেই তাঁদের পরিচয় না- খুঁজে সত্য, যে-উপলব্ধি ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সে - সম্পর্কে নিজেদের সঙ্গে নিজেরা সত্যসন্ধ কিনা তার অনুসন্ধান না - করে এঁরা আসলে কোন্ জগৎ বা কোন্ সৃষ্টি গড়েননি তাই হয়ে ওঠে বিরুদ্ধবাসীদের সমালোচনার বিষয়। এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের রচনায় চেয়েছিলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাহিনির প্রাঞ্জলতা ও সরসতা এবং সেই রকম দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রকাশ— 'দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান / আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান'/ এত পিছিয়ে পড়া মন নিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হলে কবির ভাগ্যে যা ঘটা উচিত তাই ঘটেছে।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথের গুরুতর বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আলখাল্লাওয়ালা গুরুদেব নন। তাঁর রচনায় শরীরের নানা ব্যবহার সম্পর্কে এঁরা সচেতন। 'রাত - কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে উঠল'—'ল্যাবরেটারি' গল্পের এই বিবরণ বা 'তিন সঙ্গী'র অন্য দু'টি গল্প উদ্ধার করে তাঁরা দেখালেন, রবীন্দ্রনাথ তার লেখায় প্রয়োজন মতো শারীরিকতার প্রয়োগ ঘটান। তাঁর জীবনে কবে কোথায় কোন্ রমণীর উদয় ও অস্ত হয়েছে তার যাবতীয় খবরাখবরও এঁদের নখদর্পণে— আখ্যান রচনা ও গবেষণা মিশে একাকার। ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নিখুঁত দেহের গঠনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ। ঘটনার সত্যি মিথ্যে যাই হোক না কেন, কবিকে এঁরা অনেকেই ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চান। এভাবে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়ে শিথিল গল্পমালা। জানেন না, ওই যে, রবীন্দ্রনাথের গানে 'ওগো বিদেশিনী' আছে মহাকাব্যিক উপন্যাস 'গোরা'য় কেউ কেউ সমকামিতার গন্ধও আবিষ্কার করেছেন। নইলে গোরা - বিনয়ের বন্ধুত্বকে কোন্ অভিপ্রায়ে কোন্ অর্থে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন বরীন্দ্রনাথ?

কমিউনিজ্‌ম বিশ্বাসী আর একদল মানুষ কবিকে আঘাত হেনে বললেন, রবীন্দ্র সাহিত্য বুর্জোয়া - সংস্কৃতির ফসলমাত্র। যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে। বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে', দেশপ্রেমের নামে মাতাল, উন্মাদ স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আয়েনেস্কোর 'রাইনো'র নায়কের মতো বরণ করে নিয়েছিলেন সত্য কথনের পাপে একাকী হওয়ার অভিশাপ, লিখেছেন 'ঘরে বাইরে'র মতো উপন্যাস, 'ন্যাশনালিজম' -এর মতো প্রবন্ধ। এদেশের যুগান্তর অনুশীলন

আর গদর পার্টির বিপ্লবীরা তো বটেইত, গিওর্গি লুকাচ - এর মতো পশ্চিমী মহাপন্ডিতও তাই রবীন্দ্রনাথকে ব্রিটিশের চর আখ্যা দিতে দু'বার ভেবে দেখেননি। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের বিরুদ্ধেও ইংরেজ তোষণের অভিযোগ উঠেছিল। 'পথের দাবী'র মতো হাস্যকর আষাঢ়ে উপন্যাসটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ কেন 'আহা উহু' করেননি, এই ক্ষোভ কি এদেশের সরলমতি রোমান্টিক বিপ্লবীদের বুকে কম বেজেছিল! রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' ব্রিটিশরাজের বারত আগমন উপলক্ষ্যেই নাকি লেখা! পয়লা নম্বরের পুঁজিপতি প্রিন্স দ্বারকনাথের নাতি, গোঁড়া বেম্ভ দেবেন্দ্রনাথের ছেলে, জমিদারের পো জমিদার জীবনের ৬০ বছরেরও রেশি তুমি (১) চিনের লোকেদের কামান দেগে আফিম গেলানো (২) কঙ্গোতে বেলিজিয়ানদের ওপর বর্বর অত্যাচার, (৩) আফ্রিকার বর্ণান্ধ শেতাঙ্গদের অমানুষতা, (৪) জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যা, (৫) বঙ্গভঙ্গ (৬) হিজলি জেলে গুলি চালিয়ে বন্দি হত্যা, (৭) হিটলারের বোঁচা গোঁফের হুমকি (৮) পাশচাত্য সাম্রাজ্যবাদের হাতে পারস্যের শ্বাসরোধ (৯) স্প্যানিশ সাধারণতন্ত্রের ্যপর ফ্যাসিস্ত আক্রমণ, (১০) গান্ধিজির অলৌকিক ফতোয়া —এসবের বিরুদ্ধে একটানা যতই অভিয়ান চালিয়ে যাও না কেন, তুমি কিন্তু দেশের একনম্বর শত্রু, 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল'। 'খড়ের বাছুর', 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'বুর্জোয়া'— কী নও তুমি, রবীন্দ্রনাথ। (১১) তুমি লিখতে পারনি 'আকাশ থেকে রাইফেল ঝরে পড়ুক'। তোমার গান শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, সর্বকর্ম পন্ড হয়ে যায়, মানুষ বিহুল হয়ে পড়ে— যেমনটি হত বিঠোভেন শুনতে শুনতে, পুশকিনের প্রেমের কবিতা পড়তে পড়তে লেলিনের। তোমার লেখায় শ্রীকাকুলামের বসন্ত নির্ঘোষের পূর্বাভাস নেই। তোমার ছবিতে সোশ্যায়ালিস্ট রিয়েলিজমের ছিঁটেফোঁটা গোয়েন্দা লাগিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না।— কতই তো আন্তর্জাতিক বাজার তোমার চিত্রকলার কদর! জীবনভোর শুধুই সিম্ফনির কথা বলেছে, ক্যাকোফোনি নয়। তুমি কমপ্রাদর—আধুনিকতার জাতশত্রু, চক্রান্তকারী! (১২) এই শতকোটি লোক - গিজগিজ দেশেও নিঃসঙ্গ তোমাকে কেটে ছেঁটে টুকরো টুকরো করে যে যার প্রয়োজনে ব্যবহার করে যাচ্ছে। কিন্তু কোনও কাঠামোর মধ্যে তোমাকে আঁটতে না - পেরে কেউ কেউ তোমার পায়ে কুত্তার মতো মুখ ঘষেছে। তোমার মাতৃস্তন্য মাতৃভাষা—লুডিক্রাস। ও হ্যাঁ, এতদিন তো আমাদের মতো আহামকদের জানাই ছিল না বুর্জোয়া রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন কথাটা। না না কমরেড, তুমি আর বুর্জোয়া নও, তুমি আমাদের কমরেড! আমরা ভুল করেছিলাম। তুমি এখন আমাদের অহরহের নিশ্বাস প্রশ্বাস! তোমার ঘাড়ে চেপেই কতো বৈতরণী পেরোতে হবে আমাদের এই দুর্দিনে। (১৩) ব্রিটিশ - রাজের গোপন পুলিশ ফাইল পেট মোটা হয়েছে বিরোধী কাগজপত্রে। ডি এল রায় থেকে কল্লোলের কুলতিলকেরা, এককালীন ভবানী সেন, পঞ্চাশের পিগমি কৃত্তিবাসীর দল, নাকশাল, আঁতেল নিত্যপ্রিয় ঘোষ আর তাঁর বেরাদারেরা—সবাই তোমার বিপক্ষে। অথচ তোমাকে ভাঙিয়েই কী জমজমাট ব্যওসা! তোমার নামে রাস্তা, বিশ্ববিদ্যালয়, পুরস্কার, হাজার হাজার ডক্টরেট— তাঁদের ঘরবাড়ি, বিদেশ ভ্রমণ, বিকিনি বউ, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, chevrolet তোমার ক্লিনিক্যাল রিপোর্টও এখন প্রকাশের হতে পড়ে সোনা। তোমাকে নিয়ে লেখার উপকরণও শেষ। তাই কবির শিবাম্বুতে এসে ঠেকেছে।

এঁরা নতুন করে আবিষ্কার করেছেন, (১) রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক ছিলেন, তাই মুসলমান - অধ্যুষিত নিজ জমিদারিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে হিন্দু অধ্যুষিত বীরভূমে করেছিলেন, (২) তিনি কাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল মেকি, (৩) তাঁর কথা ও কাজে সামঞ্জস্য ছিল না। মুখে বিধবা বিবাহের সমর্থনে কথা বলতেন আর কাজের বেলায় বাগড়া দিতেন। (৪) জাতিভেদ প্রথার সমর্থক ছিলেন নাকি রবীন্দ্রনাথ, (৫) প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ছিলেন— আট বছরের শিশু বা নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী, কাউকেই বেয়াত করেননি, (৬) নিজের বালিকাবধুর প্রতি প্রকারান্তরে নির্যাতন চালিয়েছেন, (৭) কবিতা-টবিতা নয়, স্রেফ গুটিগয় গানের জন্যেই টিকে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ এবং অপপ্রচারের যোগ্য জবাবা দিতে পারতেন পরম সুহৃদ এবং রবি অনুরাগী প্রিয়নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীঅরবিন্দ ও জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিশিষ্টজনেরা। আগ্রহ দেখিয়েও তাঁদের কেউ কেউ হয় নিস্পৃহ থেকেছেন অথবা নিন্দামুখর হয়েছেন। যে-ডি এল রায়ের কাছ থেকে নিন্দা, অসম্মান ও কুৎসা ছাড়া কিছুই জোটেনি, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সব রচনার গুণগ্রাহী ছিলেন। এমনকি দ্বিজেন্দ্র বিষয়ক যে - গ্রন্থে কবির আদ্যশ্রাদ্ধ করা হয়েছে সেখানেও রবীন্দ্রনাথ সপ্রশংস ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি কত জায়গায় কত কিছু বলেছেন, বলেছেন ভারতবর্ষকে জানতে হলে শুধু বিবেকানন্দকে জানলেই চলবে। আর বিবেকানন্দ? কবি সম্পর্কে একটি পরোক্ষ কটাক্ষ ছাড়া সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। স্নেহভাজন চিত্তরঞ্জন দাশকে প্রায়শ বাড়িতে ডেকে এনে তাঁর প্রিয় লুচিমাংস খাওয়াতেন। আর সি আর দাস ভাড়াটে লেখক দিয়ে তাঁর 'নারায়ণ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছেড়েছেন। সুরেশ সমাজপতিকে বৈষ্ণবপদাবলী সংক্রান্ত তাঁর যাবতীয় সংগ্রহ ও গবেষণাপত্র দান করে পুরস্কার স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণ অপদস্থ হয়েছেন পাঠকরা তো জানেন। 'স্বদেশ - আমার বাণীমূর্তি' বলে রবীন্দ্রনাথ যাঁকে প্রণাম জানান, প্রতিদানে সেই অরবিন্দ রবীন্দ্র-বিরোধী ক্যাম্পে যোগ দেন। জগদীশচন্দ্র বসুকে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠা দিতে রবীন্দ্রনাথ দিনের পর দিন লোকের দরজায় ধরনা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। সেই জগদীশচন্দ্রও রবি - বিরোধিতায় নামতে পিছপা হয়নি। রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধাশীল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মাতৃপ্রতিম কাদম্বরী দেবীকে জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রহনন করতেও ছাড়েননি। কবির বিরুদ্ধে নিরন্তর আক্রমণ রোধে রবীন্দ্রনাথের না-ছিল রাজনৈতিক ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, না কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়। তাঁর মার্জিত জীবনচর্যা ও রুচিবোধ রবীন্দ্রনাথকে সচরাচর প্রতিবাদ প্রয়াসী হতে দেয়নি। বরং লিখেছেন, 'পুনর্জন্ম যদি থাকে, তবে যেন বাঙালি হয়ে না-জন্মাই।' আর 'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে' লাইনটিও যাবার আগে মুছে দিয়ে যাব।"